মিলনসাগর
www.milansagar.com

এই লেখাটি, জেনুয়ারী ১৯৯৪ সালে, নতুন দিল্লির "কারোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালে ডঃ নবেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।

নবজীবনের গান

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

তারপর এল ১৯৪৩ সাল, বাঙলায় ১৩৫০। গোটা বাঙলাদেশ জুড়ে, বিশেষ করে শহর কলকাতায়, মহামন্বন্তরের করাল ছায়া চারদিক অন্ধকার করে দিল। আর ঘরে থাকা যাচ্ছিল না। জমাট সাহিত্যিক আড্ডা ও রিহার্সাল ছেড়ে আমরা সবাই রাস্তায় নেমে পড়লাম। চরম বিপর্যয় ও বীভৎস মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালাম।

রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতাম। চৌরঙ্গী, কালীঘাট, লেক মার্কেটের মোড়, বালিগঞ্জ... ওদিকে শেয়ালদা, শ্যামবাজারের মোড়। সর্বত্র এক দৃশ্য— শতসহস্র কঙ্কাল 'ফ্যান দাও ফ্যান দাও' বলে চিৎকার করছে। পেটের জ্বালায় গ্রাম উৎখাত করে শহরে এসে অন্নদাতা কৃষক ও জগদ্ধাত্রী কৃষাণী দু-মুঠো অন্ন ভিক্ষা চাইতেও সাহস পায় না— বলে ফ্যান দাও। মনুষ্যত্বের কী অবমাননা! গোরু-ছাগলের খাদ্য নিয়ে মানুষে মানুষে মারামারি। আর দেখলাম মৃত্যু— অমৃতের সন্তানরা মরছে যেন পোকামাকড়।

একদিন দেখলাম মা মরে পড়ে আছে। তার স্তন ধরে অবোধ ক্ষুধার্ত শিশু টানাটানি করছে আর হেচকি তুলে কাঁদছে।

এর প্রচণ্ড অভিঘাত আমার গোটা অস্তিত্বকে কাঁপিয়ে দিল। আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম— না না না না।

অস্থির পায়ে দৌড়তে দৌড়তে হেঁটে চলেছি আর মনে মনে বলছি— allow people to die. মানুষের তৈরি এই দুর্ভিক্ষ মানবো না, প্রতিরোধ করব, উত্তীর্ণ হব। হাত মুঠো করে আবার বলে উঠলাম— না না না না।

এই হলো শুরু। মনে নেই কার বাড়িতে গিয়ে হারমোনিয়াম নিয়ে বসেছিলাম, কার কাগজ ধার করে কার কলমে লিখেছিলাম। সুর আর কথা মনে বেদনা ও যন্ত্রণার রুদ্ধ উৎসমুখ থেকে ঝর্ণার মতো বেরিয়ে এল। শুরু হলো 'নবজীবনের গান' :

"না না না
মানবো না মানবো না।
কোটি মৃত্যুরে কিনে নেবো
প্রাণপণে,
ভয়ের রাজ্যে থাকবো না।".

এই প্রতিবাদ আমাকে নিয়ে এল মানুষের জীবনসংঘর্ষের পাশাপাশি। হয়ে গেলাম তাদের সহযাত্রী— সংগ্রামী কবি-সুরকার-গায়ক।

আমরা 'কুইট ইন্ডিয়া' আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলাম না। কিন্তু একদিন রাস্তায় পুলিশের গুলিতে একজনকে মরতে দেখলাম। ভুলভাবে হলেও লোকটি তো ভারতের স্বাধীনতাই চেয়েছিল। ওরা তাকে হত্যা করল।

মিলনসাগর
www.milansagar.com

এই স্মৃতি আমাকে সর্বদা তাড়া করত। তার সঙ্গে যুক্ত হলো দুর্ভিক্ষের মৃত্যু। রোজই রাস্তায় মরণ দেখতাম। একদিন একটি বৃদ্ধকে দেখলাম খাদ্য চাইতে চাইতে মুখ থুবড়ে পড়ল, আর কথা নেই। কিছুক্ষণ বাদে পুলিশের লোক এসে লাঠি দিয়ে ঠেলে তাকে রাস্তায় ধারে সরিয়ে দিল।

"পথে পথে শঙ্কা
মোড়ে মোড়ে বাজে মৃত্যুর জয়ডঙ্কা।
ধন গৌরব মাখা যুদ্ধের অঙ্গ।
আমরা ত' সৈনিক
বুভুক্ষু দৈনিক
আমরা কি দেবো রণে ভঙ্গ।"

মনে বেদনা ও যন্ত্রণার রুদ্ধ উৎসমুখ থেকে ঝর্নার মতো বেরিয়ে আসতে লাগল একটার পর একটা গান— নবজীবনের গান।

এই প্রাণান্তকর জীবনযন্ত্রণাই শেষ কথা নয়, মৃত্যুকে পেরিয়ে বাঁচবই, নব-জীবনের আলো দেখবই— এই বিশ্বাস আমাদের উদ্বুদ্ধ করত। এই ছিল 'নবজীবনের গান'-এর মূল সুর।

রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে গান মনে আসত। এক-একদিন দুটো-তিনটে গানও আসত। যার বাড়ি হোক গিয়ে শোনাতাম, হারমোনিয়াম বাজিয়ে ঠিকমতো তুলে নিতাম। আবার মাঝে মাঝে দীর্ঘ ছেদ পড়ত। প্রকৃতপক্ষে, গোটা তেরশো পঞ্চাশ সাল জুড়েই 'নবজীবনের গান' সৃষ্টির পালা চলেছিল। একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলে রাখি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে নানা জন 'নবজীবনের গান' গেয়েছেন। আমরা তো ছিলামই— হেমাঙ্গ, জর্জ, সুচিত্রা, হেমন্ত প্রমুখও নানা সময়ে এ গান গেয়েছেন। 'নবজীবনের গান' গ্রন্থে প্রকাশকের ভূমিকায় বলা হয়েছিল :

"... এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত (জ্ঞানপ্রকাশ) ঘোষকে অশেষ ধন্যবাদ গণনাট্য সংঘের পক্ষ থেকেই জানাই। তাঁর মত গুণীব্যক্তি যে রকম ধৈর্য্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে একাজ অত্যন্ত দ্রুত সম্পন্ন করেছেন তাতে আমাদের আন্দোলনের প্রতি তাঁর অপরিসীম স্নেহ প্রকাশ পেয়েছে। তা ছাড়া শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার মল্লিক, সন্তোষ সেনগুপ্ত, হেমন্ত মুখার্জী ও দেবব্রত বিশ্বাসের কাছে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি।"

'মধুবংশীর গলি'-ও এই সময়েই লেখা।

ঐ কবিতা নিয়ে পাগলামি হয়েছে কম নয়। সদ্য সমাপ্ত 'মধুবংশীর গলি'-র পাণ্ডুলিপি আমার অথবা শম্ভুর পকেটে ঘুরত। অতি ব্যবহারে জীর্ণ তার অবস্থা। রাত্তিরে খাওয়ার পর শম্ভু প্রায়ই আমার বাড়ি আসত। এখন সেখানে সাদার্ন এ্যাভিনিউ— সেদিনের অন্ধকার, প্রায় ভুতুড়ে, সেই অঞ্চলে পায়চারি করতে করতে গলা ছেড়ে আমরা 'মধুবংশীর গলি' আবৃত্তি করতাম। সঙ্গে থাকত রবীন মজুমদার।

শম্ভুর অসামান্য কণ্ঠস্বর ও অনবদ্য আবৃত্তির বর্ণনা কিভাবে দেব?

"তোমারই প্রেরণা পেয়েছি
বারে বারে আনন্দে গেয়েছি

এই লেখাটি, ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪ সালে, নতুন দিল্লির "কল্লোলধারা বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালে ডঃ নরেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া

মিলনসাগর
www.milansagar.com

নিরঙ্কুশ এ জীবনের কলনাদে
ভরেছে অম্বর।
হে পঁচিশ নম্বর
মধুবংশীর গলি,
তোমাকেই আমি বলি।...''

নির্জন সেই লেকের ধারে শম্ভুর আবৃত্তি যেন প্রত্যয়ের দীপ জ্বেলে দিত যখন সে বলত :

''স্বপ্ন জেগে উঠছে, উঠেছে
স্ট্যালিনগ্রাদে, মস্কোভায়,
টিউনিসিয়ায়, মহাচীনে।
মহা আশ্বাসের প্রবল নিঃশ্বাসে
দুর্দমনীয় ঝড় উঠেছে সৃষ্টির ঈশান কোণে।''

শুধু ছেচল্লিশ নম্বরে নয়, শুধু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও না, হাটে-মাঠে শত সহস্র রাজনৈতিক সভায় শম্ভু 'মধুবংশীর গলি' আবৃত্তি করত। আমার কবিতা যত তুচ্ছই হোক, শম্ভুর আবৃত্তি সেই এক নতুন স্কুলের পত্তন করল। তার প্রভাব পড়ল নাট্যাভিনয়েও।

কিন্তু বলছিলাম কলকাতার 'পথে পথে মৃত্যুর শঙ্কা'-র কথা।

ভারতীয় ভাষায় গণনাটকের প্রথম সার্থক স্রষ্টা বিজনের ঐতিহাসিক 'নবান্ন' নাটকও এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতারই ফসল। ঐ দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে তাদের মুখের কথা সে তার নাটকে বসিয়েছে। প্রেস ফোটোগ্রাফারকে বলা 'হাড়ের খাঁচার ব্যবসা করো তোমরা?'— এমনই একটি মর্মভেদী সংলাপ।

ঐ সময়ই ঘুরে ঘুরে অজস্র অনবদ্য ফোটো তুলেছিল সুনীল জানা। আর চিত্তপ্রসাদ, জয়নাল আবেদীন এঁকেছিল অবিস্মরণীয় কিছু ছবি।

আমরা শিল্পী-সাহিত্যিকরা সেদিন সৃষ্টির প্রেরণা ও প্রয়োজনে পথে নেমেছিলাম। তাতে ফল ভালোই হয়েছিল। গণনাট্য সংঘেরও প্রকৃত স্ফুরণ এই ১৩৫০ সালে।

শুধু সৃষ্টি নয়, সেবাও করেছি, যাকে বলে হাতে-কলমে কাজ।

কালীঘাট ট্রামডিপোর কাছে মৃতদেহ পড়ে আছে। লোকাল কমিটির সেক্রেটারি কুমুদ বিশ্বাস জানতে পেরেই খবর পাঠালেন কর্নেল শিবসেস্কো (শিবশঙ্কর মিত্র) কে। মৃতদেহ অপসারণে আমরা হাত লাগালাম।

তাছাড়া লঙ্গরখানা পরিচালনা এবং পিপল্‌স রিলিফ কমিটি (পি. আর. সি)-র কাজে মদত দেওয়া তো ছিলই। এ সবই আমাদের পার্টি ডিউটি বলে গণ্য করা হতো।

আজকে শুনলে অবিশ্বাস্য মনে হবে, কিন্তু ওরই মধ্যে আমরা— বিনয়, জর্জ, আমিই বেশি, ভূপতি সুরপতিও— পার্টির নির্দেশে ট্রামওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের আহ্বানে জায়গায় গিয়ে ট্রাম শ্রমিকদের গান শেখাতুম। সদস্যদের প্রতি সেদিন জায়গায় পার্টির নির্দেশ ছিল : তোমাকে অলরাউন্ডার হতে হবে— নাচ গান বাজনা আবৃত্তি অভিনয়— সবই কিছু-কিছু শিখে রাখা চাই, যাতে কোনো একজনের অভাবে কাজ না ঠেকে যায়; এবং সমগ্রতার সাধক। অর্থাৎ

এই লেখাটি, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ সালে, নতুন দিল্লির "কল্লোলবাস বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিত কুমার নন্দ সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালে ডঃ নরেন্দুশেখর দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া

মিলনসাগর
www.milansagar.com

এই লেখাটি, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ সালে, নতুন দিল্লির "করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালে ডঃ নবেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া

কিনা পুরো মানুষ এবং পুরো শিল্পী। এই গান শেখাতেই হাওড়া ময়দানে রেল শ্রমিক এবং চাঁপদানিতে চটকল মজুরদের কাছে কতবার গিয়েছি।

বর্ধমানে কৃষক সম্মেলনে কোনো রকম স্টেজ খাড়া করে চটের ব্যাকড্রপ লাগিয়ে হ্যাজাক জ্বেলে দশ হাজার কৃষককে 'নবান্ন' দেখানো হয়। শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের কাছে এইভাবে আমরা গিয়েছি। তাদের থেকে পেয়েছি অনেক। মিথ্যে বিনয় করব না। তাদের দিয়েছিও কিছু-কিছু। আর এই পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ায় আমাদের সংস্কৃতির গুণগত ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে।

এইবার শেষ করব।

১৯৪৩-এর গোড়ায় বাছাই করে দল তৈরি হলো— 'ভয়েস অব বেঙ্গল'। হরীনদা ও বিনয় তার লীডার রাজশাহী থেকে প্রীতি সরকার (এখন বন্দ্যোপাধ্যায়)-কে আনা হলো। তার অসম্ভব মিষ্টি গলার সুখ্যাতি আগেই শুনেছি।

তৃপ্তি, শম্ভু, ঢোলকবাদক ট্রাম-শ্রমিক দশরথ লাল, প্রেম দাওয়ান, নেমীচাঁদ ও রেখা জৈন প্রমুখকে নিয়ে এই দল বেরোল ভারত ভ্রমণে।

ভারতের সংস্কৃতি-আন্দোলনের ক্ষেত্রে এ এক অতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমরা এই প্রথম আমাদের মাতৃভূমি ও তার সাধারণ মানুষকে খুব কাছ থেকে দেখলাম। এক প্রকৃত ভারতবোধ আমাদের চেতনাকে ধনী করল। আমাদের বিশ্ববোধ পেল যথার্থ ভিত্তি। নানা ভাষা-ভাষী শিল্পীরা জাতি, ভাষা ও আঞ্চলিক সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে সব থেকে বড় মর্যাদা দিল মানুষকে, সৃজনশীলতাকে।

পি. সি. যোশী তখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক। পরবর্তীকালে তিনি নিজেই নিজের রাজনৈতিক ঝোঁকের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু পার্টির সেই গৌরবের দিনে, বিশেষত কালচারাল ফ্রন্টের সেই যুগান্তকারী কর্মকাণ্ডের দিনগুলিতে, যোশীর সৃজনশীল ও মানবিক নেতৃত্বের মুক্তকণ্ঠ প্রশংসা না করাটা খুবই অন্যায় হবে। গোটা সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের তিনিই ছিলেন প্রধান Formulator. যোশী না হলে এসব এত অনায়াসে হতো কিনা সন্দেহ।

'ভয়েস অব বেঙ্গল' গড়ার পেছনেও ছিল যোশীর উদ্যোগ ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা।

এই দল কলকাতা, পাটনা, এলাহাবাদ, লখনৌ, দিল্লী, লাহোর বোম্বে ইত্যাদি ঘুরে গান গেয়ে এক লাখ পঁচিশ হাজার টাকা তুলেছিল। দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সেবার জন্য সে টাকা পি. আর. সি.-কে দেওয়া হয়।

এরপরই জন্ম নিল ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সেন্ট্রাল ট্রুপ। তখন বোম্বেতে ছিল পার্টি হেড কোয়ার্টার। রেডফ্ল্যাগ হলে আনুষ্ঠানিকভাবে আই. পি. টি. এ.-র সেনট্রাল ট্রুপের আবির্ভাব ঘটল।

আলমোড়া সেন্টার ভেঙে যেতে উদয়শঙ্কর এই সময় বোম্বে চলে আসেন। রেডফ্ল্যাগ হলের কর্মকাণ্ডের কথা তাঁর কানে পৌঁছয়। চৌপাটে তিনি একদিন আই পি টি এ-র শিল্পীদের ডেকে শ্যাডো প্লে করে 'রামলীলা'র নির্বাচিত অংশ দেখান। তারপর বিনয় ও প্রীতির গান শুনে অত্যন্ত প্রীত হন। বলেন— আমার বয়েস হয়ে গেছে, আর নতুন ভাবে শুরু করা সম্ভব হয়। রবিশঙ্কর, শান্তি বর্ধন, অবনী দাশগুপ্ত, শচীনশঙ্কর— এদের দিচ্ছি, এদের তোমরা তোমাদের দলে নাও।

মিলনসাগর
www.milansagar.com

আন্ধেরিতে একটা প্রকাণ্ড বাগানবাড়ি পাওয়া গেল। রেডফ্ল্যাগ হলের সেই বিপুল কর্মকাণ্ড আন্ধেরিতে বিপুলতর উৎসাহে চলতে লাগল। পার্টির পক্ষ থেকে লিয়জেঁর দায়িত্ব ছিল পার্বতী কৃষ্ণানের ওপর।

শিল্পীরা নাকি অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক হয়। আন্ধেরিতে সবাইকে কমিউনের জীবনযাপন করতে হতো। অথচ কোনো সংকীর্ণতাও ছিল না। পার্টির বাছা-বাছা সদস্যদের সঙ্গে থাকতেন পার্টির বন্ধু ও সহযাত্রী রবিশঙ্কর, শান্তি বর্ধন প্রমুখ। এতে ফল উভয়তই ভালো হয়েছিল।

খাদ্য ছিল নিতান্ত সাধারণ। পালা করে ঘর ঝাঁট দিতে হতো। তাছাড়া নিজের কাপড় নিজে কাচা বা নিজের থালা নিজে মাজার রেওয়াজ তো ছিলই।

রাজনৈতিক শিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল। রাস্তায় নেমে 'পিপল্স ওয়ার' বিক্রি করতে হতো। তাছাড়া মিটিং-মিছিলে যেতে হতোই। প্রত্যেকের রাজনৈতিক জীবনের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া হতো।

আর ছিল সঙ্গীত-নৃত্য-নাট্য শিক্ষা। সে শিক্ষার ব্যাপকতা, গভীরতা ও বৈচিত্র্যের কোনো তুলনা ছিল না। ফলে রোজ ভোরে তানপুরা ঘাড়ে গলা সাধত বিনয় রায়, প্রীতি; সেতার বাজাত রবিশঙ্কর।

যোশী বলতেন— নিজেকে সশস্ত্র করো। ভোঁতা বেয়নেট বা ভাঙা ব্যারেলে কি কাজ হবে?

আমি মাঝে-মাঝে কলকাতা থেকে যেতাম— 'নবজীবনের গান' শেখাতে। যাকে বলে ভিজিটিং প্রফেসর। শান্তি বর্ধন 'স্পিরিট অফ ইন্ডিয়া' নামে একটি চমৎকার ব্যালে তৈরি করেছিল— 'নবজীবনের গান'-এর খানিকটা এবং গম্ভীরা ধরনের 'গাজন' তার অংশ ছিল। গাজনে শিব সাজত শচীনশঙ্কর, পার্বতী— রেখা জৈন। এই প্রসঙ্গে রেড্ডির কথাও মনে পড়েছে। প্রকাণ্ড চেহারা— যাকে বলে শালপ্রাংশু মহাপ্রভু। Deep base গাইয়ে। তার স্বর যেন নাভিদেশ থেকে উত্থিত হতো। রেড্ডি সম্ভবত তেলেঙ্গনার লড়াইয়ে নিহত হয়।

হ্যাঁ, গণনাট্য সংঘের শিল্পীরা সেদিন জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিল।

আজকের নৃত্য-নাট্য ও চলচ্চিত্র, তথা আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর গণনাট্য সংঘের গভীর আর সুদূরপ্রসারী প্রভাব আছে। অন্যের কথা দূরে থাক, আমরা, নিজেরাও এ সম্পর্কে যথোচিত সচেতন নই।

বিনয় ছিল সেন্ট্রাল ট্রুপের নেতা। তার মতো প্রথম সারির শিল্পী ও অদ্বিতীয় সংগঠকের পক্ষেই সেদিন এই গুরুদায়িত্ব পালন সম্ভব হয়েছিল। সমস্ত কারণেই তার এই পর্বের ইতিহাস লেখা উচিত।

তারপর ১৯৪৮ সাল এল। আমরা আত্মগোপন করলাম। মখদুম মহীউদ্দিনের সঙ্গে এই সময় কিছুদিন এক জায়গায় থাকতে হয়। ঐ ঝোড়ো দিনগুলিতেই মখদুম আমাকে 'ইয়ে জঙ্গ হ্যায় জঙ্গ এ আজাদী' গান শেখায়।

আত্মগোপন অবস্থা থেকে বিনয় আটচল্লিশ সালেই উধাও হয়। সেন্ট্রাল ট্রুপ কার্যত ভেঙে যায়, আন্ধেরির পালাও চোকে। বি. টি. রণদিভে তখন পার্টির সাধারণ সম্পাদক।

এই সময় একদিন মস্কো রেডিও খুলে শুনি আমাদের গানগুলি গাওয়া হচ্ছে, বিনয়ের গলা। আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে। পরে জানতে পারি পালিয়ে বিনয় মস্কো চলে গেছে। মস্কো রেডিয়োর ভারতীয় বিভাগের প্রধান সংগঠকের দায়িত্ব নিয়েছে। এইভাবে 'নবজীবনের গান' ভারতের বাইরে নতুন পৃথিবীর শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে যায়।

এই লেখাটি, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ সালে, নতুন দিল্লির "কনভেনশন বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালে ডঃ নরেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।